কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা সম্পর্কিত সুপারিশের বিশ্লেষণ এবং বর্তমানে নারীশিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা

পারমিতা সাতঁরা[১] এবং অনন্ত হালদার[২]

বি.এড. বিভাগ, বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ – ৭১১১০১, ভারতবর্ষ

[১]paramita.santra1234@gmail.com [২]anantahalder86@gmail.com

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে মহিলা শিক্ষার ও শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগের গুরত্ব উপলব্ধি করেন। যার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করেন। স্বাধীনত্তোর কালেও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা নানান কুপ্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, ধর্মবিরোধী প্রথায় জর্জড়িত ছিল। মহিলারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, পুরুষদের হাত থেকে নানাভাবে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হত, এমনকী তারা বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছোঁয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। মহিলা শিক্ষার হার এতটাই কম ছিল, যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে শিক্ষার প্রতিযোগিতায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে ছিল, যা পরর্বতীকালে ভারতের জাতীয় শিক্ষাস্তরে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়াঁয়। ভারতের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সমস্যা দূরীভূত করার জন্য ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশন গঠিত হয়। এই গবেষণার উদ্দ্যেশ্য নারীশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যতা বিষয়ে কোঠারি কমিশন প্রদত্ত সুপারিশগুলোর আলোকপাত ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ এবং নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতার জন্য কোঠারি কমিশনের পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলির আলোচনাকরণ ও স্বাক্ষরতার হারের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা। কোঠারি কমিশনের পূর্ববতী ও পরবর্তী সময়ে ভারতে শিক্ষার হারের অগ্রগতির পরিবর্তনের লক্ষ্য ভারতীয় সরকারের উদ্যোগে ভারতে নানান কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়, যেমন এস. এস. ভাটনগর কমিটি (১৯৪০), ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮), ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫২), থেক্কার কমিটি (১৯৫৯), কোঠারি কমিশন (১৯৬৮)। উপরে উল্লিখিত কমিশন ও কমিটি গৃহীত নীতিগুলি অধিগ্রহণের পর থেকেই ভারতের নারী-পুরুষের শিক্ষার হার এবং সমাজে দুঃস্থ ও দরিদ্র অনগ্রসর জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাগণের শিক্ষার হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীশিক্ষা, সাম্যের জন্য শিক্ষা ও শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারতে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ও নারী-স্বাক্ষরতার হার এবং নারী-পুরুষ শিক্ষার হারের ব্যবধান দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার গৃহীত অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড (১৯৮৭) কর্মসূচির মাধ্যমে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়, ফলে ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতে শিক্ষার হার ৮.৬% বৃদ্ধি পায়। জেলায় জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের খাদ্যদানের ও শিক্ষাকে সর্বজনীন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করার লক্ষে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে শিক্ষার হার ১২.৬% বৃদ্ধি করে, যার প্রভাবে ১৯৭১ সালের মোট জনসংখ্যার হার ছিল ৩৪.৯% তা থেকে ৩৯.৯% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৭৪.০% হয়। ১৯৭১ সালে ভারতে মহিলা স্বাক্ষরতার হার ছিল ২১.৯% কিন্তু সরকার গৃহীত কুর্স্তভা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, মডেল স্কুল, অন্যান্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নারীশিক্ষার হার ৪৩.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬৫.৫% হয়।

সূচকশব্দ : কোঠারি কমিশন, নারীশিক্ষা, সাম্যের শিক্ষা।

ক. ভূমিকা

দেশের ভবিষৎ হল শিক্ষা, তাই শিক্ষাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংবিধানে বলা হয় দেশের ৬-১৪ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। শ্রী কপিল সিব্বাল, Ministry of Human Development এর "General Policy Debate" পত্রিকায় প্রকাশিত UNESCO এর ৩৬তম সন্মেলনে ভারতীয় শিক্ষার প্রসঙ্গে বলা হয় যে, "Education is the only real tool of empowerment. Western nation and East Asia reaped the benefits of the demographic divided.Now the fruit of his divided are seeds in India. The middle East and Africa the youth here represent the powerhouse, of the global economy, if we fail them, they will fall us". মহিলারা হল সমাজের এমন এক অংশ যার দ্বারা দেশের ভবিষ্যতের ভিত সুদূর হয়। রাজারামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ দার্শনিক ও মণীষীগণ নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং যার জন্য ঊনারা নানান প্রতিবাদে সোচ্চার হন। স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা ও গঙ্গাসাগরে কন্যা সন্তান বির্সজন ইত্যাদি কুপ্রথার জন্য মহিলারা পদধূলির মতো সমাজে অবস্থান করত। শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা। আর এই শিক্ষা লাভ তখনই সম্ভব যখন দেশের শিক্ষার জন্য সঠিক পদ্ধতি, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও বিষয়বস্তু গৃহীত হবে এবং তা শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথভাবে রূপায়িত হবে। শিক্ষা হল জাতীয় মেরুদন্ড কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজি ভাষা জানা কিছু কেরানী কর্মচারী সৃষ্টি করা। স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে সংবিধান রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিম্ন শ্রেণি ভেদাভেদ, জাত-পাত, বর্ণভেদ প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় সমতাদানের নীতিকে মান্য করার কথা বলা হয়। উডের শিক্ষা ডেসপ্যাচের (১৮৫৪) মাধ্যমে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতেই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনঃগঠন ও সংস্করণ হয়েছিল। স্বাধীনতার সময় ভারতীয় সংবিধান সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানান সংরক্ষণমূলক নির্দেশ দেন। সরকার গৃহীত এস.এস.ভাটনগর কমিটি (১৯৪০), রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩), থেক্কার কমিটি (১৯৫৯-৬১), কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৬), দাসোদারান কমিটি (১৯৭০), এল.এস.চন্দ্রকান্ত কমিটি (১৯৭১), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬), জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮) প্রভৃতি কর্মসূচি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যথেষ্ট কার্যকর। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২) এর সীমাক্ষেত্র ছিল যথাক্রমে উচ্চশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কিন্তু ১৯৬৪ তে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষার সমগ্র স্তরে ও জাতীয় শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১৯৬৪ খ্রিঃ ১৪ই জুলাই ডঃ ডি.এস কোঠারি ও মোট ১৭ জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করে। কমিশনের এই রির্পোটটি Education and National development শিরোনামে পেশ করা হয়। রির্পোটটিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাঠামো, উচ্চ শিক্ষার কাঠামো, প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম, মহিলা শিক্ষা, শিক্ষায় সমসুযোগ ও আরোও অন্যান্য বিষয়ের উপর সুপারিশ পোষণ করেছেন। দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনে শিক্ষা এক মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। জাতীয় শিক্ষা পারে নারীশক্তির ধনাত্মক দিকগুলি বজায় রাখতে ও বিকাশ সাধন করতে। নারীশিক্ষা প্রতিটি মহিলাকে যেমন আত্মস্বাবলম্বী করে তোলে তেমনি দেশে লিঙ্গবৈষম্য কম করতে সাহায্য করে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি, শিশু-শ্রমিক কম করা ও প্রতিটি শিশুর নিজের শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে শিক্ষায় সাম্য বা সমসুযোগের কথা বলা হয়। যার ফলপ্রসূ দেশে মানব উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব।

খ. সাহিত্যের পর্যালোচনা

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন গবেষণা পত্র ও অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। সে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ প্রভৃতির পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নে সংক্ষিপ্ত রূপে তুলে ধরা হল।

১. সুমিরকুমার সাহা এবং সঙ্গীতা ঘোষ রচিত Commission & committee on technical education in independent india : An apprasial গবেষণা পত্র ২০১২ সালে Indian Journal of History of Science পত্রিকায় প্রকাশ পায়। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সর্ম্পকে বিস্তর আলোচনা, কমিশনে গৃহীত বৃত্তি শিক্ষার বিষয়ের সুপারিশগুলির আলোকপাত করেছেন।

২. শম্পা বর্মন রচিত Policies and recommendations of women education in the context of modern Indian History গবেষণা পত্র ২০১৫ সালে International Journal of Applied Reserch পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কমিশন প্রসঙ্গে তথ্য দিয়েছেন। সংবিধানের প্রস্তাবনা, বর্তমানে শিক্ষার অবস্থা বিভিন্ন গৌণ উৎসের সাহায্য ছকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। ২০১৩ সালের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের ভর্তি হারের পরিসংখ্যান বেড়েছে তা তিনি বলেছেন।

৩. নিসা রায়ের রচিত Women Education in India A Situtional Analysis গবেষণা পত্র March মাসে ২০১০ সালে প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি ও বর্তমানে মহিলা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সর্ম্পকে পর্যালোচনা করেছেন। ভারতীয় প্রতিটি শিক্ষাস্তরে বাধাসমূহ ও রাজ্য অনুসারে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারকে স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

৪. মুনমন দত্ত রচিত "বিবেকী কন্ঠস্বরে স্বামীজির নারীশিক্ষা" প্রকাশিত গবেষণা পত্র International Journal of Humanitics & Social Science পত্রিকায় ২০১৭ সালে প্রকাশ পায়। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে উক্তি, স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছন।

৫. কিশোরসিং রচিত Right to Education of Equality of Educational opportunities গবেষণা পত্র Journal of International Cooporeation in Education পত্রিকায় ২০১৪ সালে প্রকাশ পায়। সমতার জন্য শিক্ষার কিছু মৌলিক অধিকার ও সাম্যের জন্য শিক্ষার ক্ষেএে বাধা এবং সমসুযোগের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে সেই বিষয় আলোচনা করেছেন।

৬. জনধয়াল বি.জি. তিলক, ন.ভি ভার্গিস রচিত Resources for education for all গবেষণা পত্র Journal of Education and Social Change পত্রিকায় ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। ভারতে শিক্ষাখাতে খরচ, প্রারম্ভিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পযর্ন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীনতা এবং শিক্ষায় সমসুযোগের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যম গবেষণা করেছেন।

গ. উদ্দেশ্য

১. কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা বিষয়ে সুপারিশগুলোর উপর আলোকপাত করা।

২. নারীশিক্ষা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্যতা বিষয়ে কোঠারি কমিশন প্রদত্ত সুপারিশগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ।

৩. কোঠারি কমিশনের পরবর্তী দশকগুলিতে পুরুষ-মহিলা স্বাক্ষরতার হারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

৪. নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতার জন্য কোঠারি কমিশনের পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলির আলোচনা করা।

ঘ. পদ্ধতি

সমাজের নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যের জন্য শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাগুলিকে উপলব্ধি করে কোঠারি কমিশনের উল্লেখিত নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা বিষয়ের সুপারিশগুলির বিশ্লেষণ ও বর্তমানে নারীশিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়টিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্যেগুলি মাথায় রেখে গবেষণাটি সম্পূর্ণ করবার জন্য মাত্রিক ও গুণগত তথ্যের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক, অন্তঃজাল, তথ্যসূচি, প্রতিবেদন ও পত্রিকার সাহায্যে বিভিন্ন তথ্যগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য পরিসংখ্যানগত ছক ও স্তম্ভচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

ঙ. বিশ্লেষণ

ঙ.১ কোঠারি কমিশনে নারীশিক্ষা বিষয়ে সুপারিশগুলি আলোচনা

নারীশিক্ষা দ্রুত প্রসারকল্পে কমিশন নারীশিক্ষার জাতীয় কমিটির সঙ্গে সহমত হয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ দেন। কমিশন যে শুধু নারীশিক্ষা বিষয়ের উপর সুপারিশ দেন তা নয়, ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক নিরীক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা ও আরও অন্যান্য বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা বলেন। নিম্নে নারীশিক্ষা বিষয়ের সুপারিশগুলি আলোচিত হল।

১. ১৯৬৪ সালের আগে ভারতে নারীশিক্ষার হার এতটাই কম ছিল যে অন্য দেশের তুলনায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। কিন্তু পুরুষরা নারীদের তুলনায় শিক্ষার হারে অনেকটাই এগিয়ে ছিল, ফলে নারী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবধান অনেক বেশি ছিল। এই ব্যবধান কম করার জন্য সুপারিশে বলা হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য কম করতে হবে ও আরও বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারী-পুরষের শিক্ষার হার সমান করতে ।

২. মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির লক্ষে যে যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করা দরকার সেই পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্দ্যত হতে হবে ও এই পরিকল্পনা সফলের জন্য যা অর্থ ব্যয় হবে তার আর্থিক সাহায্যে দেবে সরকার।

৩. বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মহিলাদের কথা বিবেচনা করে উচ্চ শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের অনুপাত কম করতে হবে। প্রতি ৪ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন নারীকে শিক্ষিত না করে, প্রতি ৩ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৪. পুরুষ-নারীর পাঠ্যক্রম এক করতে হবে। মেয়েরা শুধু গৃহ নিপুণার কাজ না শিখে, বিজ্ঞান, কলা বিভাগে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। হোম সায়েন্স, নার্সিং, বৃত্তি ও কারিগরী প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দান করতে হবে।

৫. অত্যাধিক দারিদ্র্যতার কারণে মেয়েরা যাতে পড়াশুনো ছেড়ে না দেয়, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের পড়াশুনোর যাবতীয় খরচ চালাতে পারে তার জন্য স্কলারশিপ প্রদানের কথা বলা হয়।

ঙ.২ কোঠারি কমিশনকৃত শিক্ষায় সাম্যতা বিষয়ে সুপারিশগুলির আলোচনা

দেশে শিক্ষায় সাম্য নিয়ে আসতে গেলে ভারতে যে সমস্ত অনগ্রসর জাতি, দুঃস্থ, চরম দারিদ্র্য সম্পন্ন মানুষ, তপশিলি জাতি, উপজাতি আছে তাদেরকে শিক্ষার আওতায় আনতে হবে কারণ এই সব মানুষই শিক্ষার নানান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও এরা সকলেই শিক্ষাগত যোগ্যতাতে অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। এই সকল মানুষগণের শিক্ষায় সাম্য আনার জন্য ড. ডি. এস কোঠারি ও আরও ১৭ জন সদস্য মিলে সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ পেশ করেন। সুপারিশগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে।

২. দেশের প্রতিটি শিশু যাতে নূন্যতম শিক্ষা গ্রহণে মনোযোগী হয়, তার জন্য কমিশন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলার সুপারিশ দেন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা ছাড়াও কোনো শিক্ষার্থী যদি উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে তৎপর হয় তাহলে সরকার যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

৩. ভারতে এমন অনেক পরিবার আছে যারা আর্থিক সম্যসার কারণে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক, স্কুলের পোষাক কিনে দিতে ব্যর্থ হয়, এই ধরনের সম্যসাগুলি এড়ানোর জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকার থেকে পাঠ্যপুস্তক ও স্কুলের পোষাক বিতরণ করার কথা বলেন।

৪. প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়ার কথা বলা হয়। তপশিলিজাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ করতে হবে ও এদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়।

৫. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভেদাভেদ লঙ্ঘন করে একই ছাদের নিচে অর্থাৎ একই শ্রেণিকক্ষে সকলেই সমভাবে পড়াশুনোর সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। এর জন্য কমিশন Common School System চালু করার নির্দেশ দেন।

৬.৩ নারীশিক্ষা বিষয়ক কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

কোঠারি কমিশন নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নারীশিক্ষা সম্প্রসারণের উপর জোর দেন। কমিশনকৃত সুপারিশ গুলির মহিলা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা নেয়। তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

৬.৩.১ নারীশিক্ষার সুপারিশগুলির ইতিবাচক দিক

১. সুপারিশে বলা হয় মেয়েদের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা, যা নারীশিক্ষা ও সমাজের উন্নয়নের প্রতি সহায়ক। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের নারীদের মতো ভারতের মহিলারাও বিদেশে কর্মরত থাকলে মহিলাদের যেমন শিক্ষায় উন্নতি ঘটবে তেমনই নিজস্ব জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে অতএব এই সুপারিশটির সাহায্যে ভারতীয় সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রচিত হবে।

২. সুপারিশে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলার কারণে সমাজে প্রতিটি মেয়ের সামাজিক নিরাপত্তার দিকটিও অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে। এর ফলে মেয়েরা নির্ভয়ে স-সম্মানের সঙ্গে বিদ্যালয় বা কলেজে পড়াশুনো করার সুযোগ পায় এবং দেশে মেয়েদের উপর নানান অপরাধমূলক কাজের পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমবে।

৩. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অনুপাত ১:৪, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিতা মহিলার চাহিদার কথা বিবেচনা করে অনুপাতকে বৃদ্ধি করে ১:৩ করতে হবে। এর ফলে মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় ও নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান কমবে যার ফলস্বরূপ লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

৬.৩.২ নারীশিক্ষার সুপারিশগুলির নেতিবাচক দিক

১. কমিশনে বলা হয় বিয়ের বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্য পূর্ণকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করতে, কমিশনকৃত এই সুপারিশটি ব্যর্থ হয় কারণ সরকার এই বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি জেলাতেই দুই তৃতীয়াংশ মহিলারা বর্তমানে আংশিক সময়ের জন্য নিজের বাড়িতে হস্তশিল্পের ও সাংসারিক কাজে যুক্ত

থাকে। ফলে সরকার পক্ষ থেকে কোনোভাবেই পূর্ণকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি, যার প্রভাব দেশে বেকারত্বের উপর পরে।

২. কমিশনের রির্পোটটিতে নারীশিক্ষা বিষয়ে আরও একটি সুপারিশে কথা বলা হয়ে থাকে, ছেলে ও মেয়েদের পাঠ্যক্রমের পার্থক্য করা যাবে না, এই সুপারিশের কিছু ভালোগুণ থাকলেও পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা হয় মেয়েদেরকে গার্হস্থ্য বিদ্যা, নার্সিং শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয় পড়ানোর উপর জোর দিতে। যা এই সুপারিশ পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে মেয়েদেরকে গার্হস্থ্যশিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা দেওয়া জরুরি, কিন্তু সুপারিশে কোনো জায়গায় এই শিক্ষা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার কথা উল্লেখ নেই ফলে এর থেকে স্পষ্টত নারী-পুরুষের পাঠ্যক্রমে বৈষম্য ঘটছে। নারী-পুরুষের অধিকারের ব্যপারে একটা সীমারেখা নির্দেশ করছে যার কুফল মহিলাদের উচ্চাক্ষার উপর পরছে।

৩. সুপারিশে উল্লেখ আছে মেয়েদের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণে ও কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা। ভারত দ্বিতীয় জনসংখ্যাবহুল দেশ হওয়ার কারণে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাই অনেক কম আবার সেখানে নতুন করে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাবার কথা ভাবাই অপ্রাসঙ্গিক। কোনো ক্ষেত্রে তা সম্ভব হলেও কিছু রাজনৈতিক অরাজকতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধা দান করে। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে এই সুপারিশ নারীশিক্ষা উন্নয়নে যথার্থ নয়।

৬.৪ সমসুযোগে বিষয়কগুলির সমালোচনামূলক আলোচনা

কোঠারি কমিশন শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষায় সাম্য আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কমিশনকৃত সুপারিশ গুলি কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে তা নিম্মে আলোচিত হল।

৬.৪.১ শিক্ষায় সমসুযোগের ইতিবাচক দিক

১. শিক্ষায় অসাম্যতা দূরীকরণের জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়ার আগে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলার কথা বলে, এটি সুপারিশের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক কারণ দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা না গেলেও তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার অর্ন্তভুক্ত করা যাবে ও দেশের স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায় যার ফলে দেশের মানুষ নূন্যতম শিক্ষার অধিকারী হবে। এই সুপারিশটি লক্ষ্যপূরণ করা আরও বেশি সহজ হয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অবৈতনিক করে দেওয়ার কারণে। ভারতে যাদের আর্থিক স্বচচ্ছলতা নেই তারাও এই শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসার সুযোগ পায় ফলে দেশের শিক্ষায় বৈষম্য কমে।

২. শিক্ষায় সর্বস্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয় এই সুপারিশে। যার ফলে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বৃত্তিদানের সাহায্য পেয়ে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যেই স্তরে যতটা পড়াশুনোর জন্য খরচ হয় ঠিক ততটুকু বৃত্তিদানের কথা বলা হয় এর জন্য শিক্ষাখাতে অর্থনৈতিক অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় ও দেশের কোনো শিক্ষার্থী বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না, ফলপ্রসূ দেশে শিক্ষায় সাম্যতা বিরাজ করে। সুপারিশকৃত এই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়।

৩. শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করার জন্য কমিশন সুপারিশ দেন বিদ্যালয় গুলিতে "কমন স্কুল সিস্টেম" চালু করতে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জাতি ও ধর্মের শিক্ষার্থী একই বিদ্যালয়, একই পদ্ধতির শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। ফলে বিদ্যালয় পরিবেশে কোনো রকমের জাতিভেদ ও বর্ণভেদের সমস্যা দেখা যায় না। ফলে এই সুপারিশের দরুণ ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক রচিত হয়।

৬.৪.২ শিক্ষায় সমসুযোগের নেতিবাচক দিক

১. পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকরী হওয়ার মধ্যেই সুপারিশে দেশের সরকারি ও সরকার স্বীকৃত প্রাইভেট স্কুলগুলিতে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কথা বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কিছু সরকারি স্কুল আছে যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নূন্যতম বেতন ও বিদ্যালয়ে পড়াশুনো প্রাসঙ্গিক কিছু খরচ নেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের বেশির ভাগ সরকার স্বীকৃত প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলি বেতন নিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে সমাজের কিছু মানুষের নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য এই সুপারিশ ব্যর্থ হচ্ছে ও নেতিবাচক দিক লক্ষিত হচ্ছে।

২. সুপারিশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষায় সমসুযোগ আনার লক্ষ্যে বুক ব্যাঙ্ক গঠন ও লাইব্রেরি উন্নতিসাধনের কথা বলা হয়। ভারতের মতো দেশের স্কুল কলেজগুলিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি মেনে চলা প্রায় অসম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রই দেখা যায় স্কুল-কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই পাওয়া যায় না, এবং নতুন বই এর সংখ্যা খুবই কম। লাইব্রেরিগুলির ব্যবস্থাপনায় কিছু অলসতা লক্ষ করা যায়। অনেক সময় শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি সর্ম্পকে সচেতনতার অভাবে লাইব্রেরিগুলির ঐতিহ্য ধূলিসাৎ হচ্ছে। কিছুক্ষেত্রে লাইব্রেরিগুলিতে পক্ষপাতমূলক আচরণ হওয়ার কারণে শিক্ষায় সমসুযোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এই সুপারিশ।

৩. শিক্ষায় সমসুযোগ আনবার জন্য গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষ ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিন অতিবাহিত করে ফলে তারা তাদের শিশুদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় পড়াশুনোর প্রতি কোনো রকম আগ্রহ থাকে না, বেশির ভাগ অভিভাবক পড়াশুনোর গুরুত্ব বুঝতে অসক্ষম। সরকার এই ব্যপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও অভিভাবকের উদাসীনতার জন্য সুপারিশটি বাড়ে বাড়ে ব্যর্থতায় পর্যভূষিত হচ্ছে।

৬.৫ কোঠারি কমিশনের পরবর্তী দশকগুলিতে পুরুষ ও মহিলার স্বাক্ষরতার হারের অগ্রগতি পর্যালোচনা

স্বাধীনতার পূর্বে মহিলারা শিক্ষার গন্ডী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করত, সেই সময় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন চালু হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতি ঘটলেও ঠিক তেমন ভাবে সুদূরপ্রসারী সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি। কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি কার্যভূষিত হওয়ার পর ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ভারতে দিনে দিনে মহিলা-পুরুষের স্বাক্ষরতার হারের পার্থক্য আরো অনেক বেশি স্পষ্ট হচ্ছে, যাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার ব্যবধান। কোঠারি কমিশন সুপারিশ নির্দেশিত হওয়ার পর যেমন ভারতে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার হার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার ব্যবধান বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে তা নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল।

তালিকা ১: ভারতে স্বাক্ষরতার হার

সাল	মোট (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)	নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার ব্যবধান
1971	34.4	45.9	21.9	23.9
1981	43.6	56.4	29.8	26.0
1991	52.2	64.1	39.8	24.8
2001	64.8	75.3	53.7	21.6
2011	74.0	82.1	65.5	16.6

উৎস: Census of India, 2011

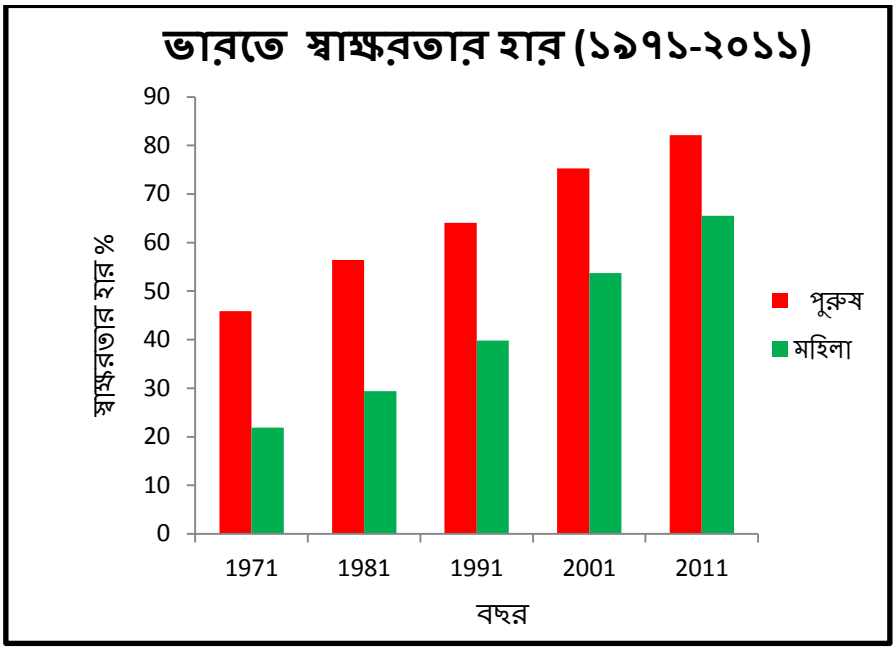

উপরের উল্লিখিত ছকটিতে ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির হারের গতিপ্রকৃতি দেখানো হয়েছে। উপরের পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যায় ১৯৭১ সালে ভারতে মোট ৩৪.৪৫% মানুষ স্বাক্ষর ছিল, যা ১৯৯১ তে বেড়ে হয় ৫২.২% ও যদি আরও বিংশ শতকের দিকে এগোনো যায় তাহলে দেখা যাবে স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক হয়েছে ২০১১ তে যার ৭৪.০% । ১৯৭১ থেকে ২০১১ সালের মোট স্বাক্ষরতার হার ৩৯.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক একই পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় মহিলা স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালে নারী স্বাক্ষরের হার ছিল ২১.৯৭%, কিন্তু ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৫.৫%। ১৯৭১ সালে মহিলা-পুরুষের শিক্ষার ব্যাবধান ছিল ২৩.৯৮%, যা পরবর্তীকালে কমে গিয়ে হয় ১৭.০% ও ১৯৭১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে নারী –পুরুষের শিক্ষার ব্যাবধান ৬.৯% কম হয়েছে । সকল পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় নারী-পুরুষের স্বাক্ষরতার হার দ্রুতগতিতে পরিবর্তন হচ্ছে ও নারীশিক্ষার হার সাফল্যের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

৬.৬ নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা অনায়নে কোঠারি কমিশনের পরর্বতী সময়ে ভারত সরকার গৃহীত কর্মসূচি গুলির আলোচনা

ভারতবর্ষে স্বাক্ষরতার হার, মহিলা স্বাক্ষরতার হারের বৃদ্ধির পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত সরকার অনেক বেশি আগ্রহী ও তৎপর হন। সরকারের অন্যতম গুরুত্বর্পূণ লক্ষ্য হয়ে ওঠে মাধ্যমিক শিক্ষা ও মহিলা শিক্ষার হারকে বিকশিত করা ও শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো। ভারতীয় শিক্ষাস্তরে গুরুত্বর্পূণ স্তর হল মাধ্যমিক শিক্ষা, সমাজে মহিলা শিক্ষার হারের প্রসারকে ত্বরাণ্বিত ও সর্বজনীন করবার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কতকগুলি প্রকল্প চালু করেন। প্রকল্পগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, ১৯৮৭

জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ অনুসারে এই কমর্সূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা। ১৯৮৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই কর্মসূচি শুরু হয়। এই কর্মসূচিতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূন্যতম কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার, বারান্দা সহ দুটি হলঘর, প্রয়োজনীয়

ব্যবহারযোগ্য ব্ল্যাকবোর্ড, ম্যাপ, চার্টস, খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ চালু করার কথা বলা হয়। সারা ভারতে প্রায় ৯১% প্রাথমিক বিদ্যালয় এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি, ১৯৯৫

১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা এই কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত শিশুর বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। দলছুট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১০% এর কম করতে হবে। স্বাক্ষরতার সাফল্যের হার শতকরা ২৫% বাড়াতে হবে। এই কর্মসূচিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়। এই কর্মসূচির উদ্দেগ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ব্লক সম্পদ কেন্দ্র ও গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র গঠন করা হচ্ছে।

৩. মিড-ডে মিল, ১৯৯৫

মিড-ডে মিল প্রকল্পটির আরেকটি নাম National Programme of Nutritional Support to Primary Education, এই কমর্সূচিটি ১৯৯৫ সালে চালু হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাথমিক স্তরে সমস্ত শিশুদের দেহে পুষ্টি প্রদানের জন্য খাদ্যদান করা। সাধারনত ক্ষুর্ধাত শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ানোর প্রচেষ্টা। এই কর্মসূচিটি সমস্ত জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ম্পক গড়ে তোলে ও শিশুদের স্বাস্থ্যবান ও মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

৪. সর্ব শিক্ষা অভিযান, ২০০১

সর্বশিক্ষা অভিযান সমাজগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত মানবিক সার্মথ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রদত্ত সেবামূলক এক প্রচেষ্টা। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এই কর্মসূচির প্রকৃত উদ্দেশ্য ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় আনা। এটি একটি জেলাভিত্তিক প্রারম্ভিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তুতকরণ।

৫. স্বধারগ্রাহ (২০০১-২০০২)

মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয় স্বধারগ্রাহ প্রকল্পটি বাস্তবায়ণ করার অন্যতম লক্ষ্য, কঠিন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলারা যাতে সম্মানের সাথে তাদের জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে মহিলা দের পুনর্বাসন দানের ব্যবস্থা করা। ২০০১-২০০২ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি আশ্রয়, খাদ্য, পোশাক এবং পুনর্বাসনের প্রাথমিক প্রয়োজন সরবরাহ করে।

৬. NATIONAL PROGRAMME FOR EDUCATION OF GIRLS AT ELEMENTARY EDUCATION (২০০৩)

এই প্রকল্পটি ২০০৩ সালে শুরু হয়েছিল। দেশের যে সমস্ত জায়গায় মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হয়নি সেই শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির উপর জোর দেওয়া হয়। মেয়েদের স্কুল ড্রেস, বই খাতা, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানের কথা বলা হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য লিঙ্গবৈষম্য দূর করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে শিশুদের গুণগত শিক্ষা দেওয়া হয়।

৭. INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY প্রকল্প (২০০৪)

কেন্দ্রীয় সরকারের সহচর্যে ২০০৪ সালে ডিসেম্বর মাসে এটি চালু হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ICT এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করানো, প্রতিটি নবোদয় বিদ্যালয়গুলিকে SMART SCHOOL এ পরিণত করা, প্রতিটি SMART SCHOOL ৮০ টি কম্পিউটার রাখতে হবে।

৮. কস্তুভা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় (২০০৪)

এই প্রকল্পটি চালু ২০০৪ সালে। আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধির করার কথা বলা হয়। দারিদ্র সীমার নীচে বাসকারী পরিবারের মেয়েদের জন্য প্রতিটি স্কুলে ২৫% এবং বাকি ৭৫% তপশিলি, উপজাতিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সুরক্ষিত থাকবে।

৯. রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (২০০৯)

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ভারতজুড়ে সরকারি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার বিকাশের জন্য ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয়ভাবে স্পনসারিত একটি প্রকল্প ২০০৯ সালে মার্চ মাসে চালু হয়। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের প্রাথমিক লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে কীভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হবে সেই ব্যবস্থার উন্নতি করা, সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার স্কুল গুলিকে মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য করা ও সারা দেশকে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করানো।

১০. রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (২০১৩)

এই প্রকল্পটি একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয়। প্রকল্পটি মূলত ভারতে উচ্চশিক্ষার নিম্ন তালিকাভুক্তির অনুপাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। রুশার লক্ষ্য ভারতের উচ্চশিক্ষার উন্নতি করতে ভারতীয় রাজ্য গুলিকে উৎসাহিত করা। রুশার লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির অনুপাত বাড়িয়ে ৩০% করা।

১১. SUPPORT TO TRAINING AND EMPLOYMENT PROGRAMME FOR WOMEN (STEP) ২০১৪

STEP প্রকল্পটির লক্ষ্য এমন দক্ষতা প্রদান করা যা নারীদের কর্মসংস্থান দেয় বা মহিলাদের স্বকর্মস্থান উদ্যোক্ত হতে সক্ষম করে তোলে। এই প্রকল্পটি সারা দেশে ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সের মহিলাদের উপকৃত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়েছে।

১২. Padhe Bharat Badhe Bharat (২০১৪)

এই প্রকল্পটি চালু হয় ২০১৪ সালে। প্রকল্পটি লক্ষ্য হল শিশুদের পড়ালেখায় আগ্রহী এবং স্বনির্ভর পাঠক হিসাবে গড়ে তোলা। নির্দিষ্ট বয়সের বাচ্চার মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার কথা বলা হয়। বাস্তব জীবনের দৃষ্টি কোন থেকে পড়া এবং লেখার আনন্দ বুঝতে শিশুদের সহায়তা করে, দেশজুড়ে স্কুল গুলিতে উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিশুদের উচ্চতর ক্লাসে সফলভাবে স্থানান্তর করাই এই প্রকল্পটির অন্যতম লক্ষ্য।

১৩. বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (২০১৫)

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দ্যোগে ২০১৫ সালে এটি চালু হয়। এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ মেয়েদেরকে অসামাজিক কাজ থেকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়া। সমাজে কন্যাভ্রুণ হত্যা কম করা, সমাজে প্রতিটি মানুষকে নারীশিক্ষা সর্ম্পকে সচতেনতা জাগিয়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উপসংহার

মহিলারা হল সমাজের ধারক ও বাহক। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা, তাই মহিলাদের উন্নয়ন না ঘটলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ দৃঢ় হতে পারবে না, ফলে দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় ঘটবে। নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলির কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। উল্লেখিত সুপারিশগুলির যেমন কিছু ইতিবাচক দিক আছে তেমনি কিছু নেতিবাচক দিক গুলিও বিরাজমান, এই নেতিবাচক দিকগুলির সম্যসাগুলিকে দূর করতে পারলে সুপারিশকৃত লক্ষ্যগুলি পূরণ

করতে সমর্থ হবে। তবে একথা একদমই অস্বীকার করা যায় না যে ভারত সরকার বিভিন্ন গুরত্বরপূর্ণ কর্মসূচী অপারেশন ব্ল্যাকর্বোড, সর্বশিক্ষা অভিযান, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, জেলা প্রাথমিক কর্মসূচী প্রভৃতি গ্রহনের মাধ্যমে যেমন প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের পরিমান বেড়েছে তেমনি বিদ্যালয়ে দলছুট শিক্ষার্থী পরিমান অনেক কমেছে। নারীদের স্বাক্ষরতার হার ১৯৭১ সাল থেকে প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালে নারী স্বাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ২১%, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ৬৫% হয়। নারীশিক্ষা ছাড়াও তপশিলি জাতি, উপজাতি গোষ্ঠীর শিশুদের বিদ্যালয়ের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশেষে এটা বলা যায় যে, ভারত সরকার ও প্রশাসনিক সংগঠন যদি নারীশিক্ষার গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করে এবং নারীদের ক্ষমতায়ণে সচেষ্ট হয় তাহলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং জাতীয় স্তরে উন্নয়ন ঘটবে।

তথ্য সূত্র / সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Burman, S. (2015). Policies and Recommendations of women education in the context of modern Indian History. *International Journal of Applied Research, 1*(9), 786-788.

২. Dyer, C. (2000). Education for All and the Rabaris of kachchh, Western India. *International Journal of Educational Research, 33*(3), 241-251. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0883-0355(00)00012-4

৩. Department of School Education & Literacy (1962). Ministry of Education Government of India. Retrieved from https://mhrd.gov.in/school-education

৪. Department of Education Government of India (1962). The Report of the university Education commission. Retrieved from https://www.educationforallinindia.com/1949%20Report%20of%20the%20University%20Education%20Commission.pdf

৫. Education For All Towards Quality with Equity India. (2014, August). New Delhi. Report presented to University of Educational planning and Administration. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229873

৬. Naik, J. (1982). *The education commission and after*. APH published, Retrieved from https://books.google.co.in/books/about/The_Education_Commission_and_After.html?id=j2dwx8FfCS0C

৭. Saha, S. & Ghosh, S. (2011). Commissions & committees on technical education in independent India : An appraisal. *Indian Journal of History of Science, 47*(1), 109-138.

৮. Sing, K. (2014). *Right to Education and Equality of Educational Opportunities. Journal of* International Cooperation in Education, *16*(2), 19.

৯. Sibal, K. (2011, 28 October). General policy debate. Conference conducted of UNESCO, Ministry of Human Resource Development. India.

১০. Status of literacy Census of India (2011). Retrieved from https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/literacy-rate

১১. Vijitilak, J., & Varghese, N. (1990). Resources for education for all. *Journal of Education and Social change, 4*(4), 24-59.

১২. দত্ত, ম. (২০১৭). বিবেকী কণ্ঠস্বরে স্বামীজির নারীশিক্ষা. *International Journal Humanities & Social Science, 6*(2), 10-16. Retrieved from https://www.ijhssnet.com/

১৩. রায়, প., এবং রায়, এ. (২০১৬)। *সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ ও শিক্ষা. প্রথম প্রকাশ*, কলকাতা: রীতা পাবলিকেশন।

১৪. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ। কলকাতা। উদ্বোধন কার্যালয়, চর্তুথ প্রকাশ ১৯৬০। পৃ:১৩.